ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 786-796
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.069

মহর্ষি পতঞ্জল ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ‘যোগ’: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

রাজকুমার পণ্ডিত, *শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.01.2025; Accepted: 21.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bhāratavarṣa is primarily a spiritual land with a distinct and rich cultural heritage. It has given birth to countless saints, sages, and philosophers who have continuously worked to restore and renew its spiritual traditions. These traditions, rooted in the Vedic age, have remained vibrant despite external invasions and internal upheavals. Maharṣi Patanjali and Ṛṣi Aurobindo represent two ends of this unbroken and ever-evolving spiritual tradition.

The concept of Yoga holds significant importance in the history of Bhāratīya Darśana (Indian Philosophy). Although widely discussed, different philosophical schools and thinkers have not yet to reach a consensus on the fundamental nature of yoga and its methods of practice. This article presents a comparative analysis of Maharṣi Patanjali's and Ṛṣi Aurobindo's descriptions of yoga. In Patanjali's yoga, the concept of Cittavṛtti is introduced while defining the lakṣaṇa (definition) of yoga. The five types of vṛttis (fluctuations) of citta (consciousness) are well elaborated, along with how Aṣṭāṅga-Yoga (Eightfold Yoga) leads to Kaivalya, the state of absolute liberation attained by restraining cittavṛttis. On the other hand, Shri Aurobindo discussed Purṇayoga (Integral-Yoga) by integrating the concepts of Cit (Consciousness) and Acit (Unconsusness). He envisions the realization of Divine Life through an integral evolution based on the process of descent and ascent. This article further provides a coherent analysis of the differences between Maharṣi Patanjali's Samādhi-Yoga and Shri Aurobindo's Integral-Yoga, highlighting their unique perspectives on spiritual realization.

Keywords: Akhaṇḍa-Yoga, Aṣṭāṅga-Yoga, Cittavṛtti, Saccidānanda, Samādhi, Yoga.

ভারতীয় দর্শনালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো ‘যোগ’। এই ‘যোগ’-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বেদোপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা, পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে নানান আলোচনা রয়েছে। কিন্তু ‘যোগ’কে পৃথক ও সুসংবদ্ধভাবে শাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করে মহর্ষি পতঞ্জল মানবজাতিকে এক অতি উৎকৃষ্ট উপঢৌকন প্রদান করেছেন। ‘যুজ্’ ধাতুর উত্তর ‘ঘঞ’ প্রত্যয় যোগে ‘যোগ’ শব্দটি ব্যুৎপন্ন। ‘যুজ্’ ধাতুর অর্থ হলো ‘যুক্ত হওয়া’। মহর্ষি পতঞ্জল ‘যোগ’ শব্দটিকে সাধারণ অর্থে বা

আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেননি। যোগ দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হলেও মহর্ষি পতঞ্জল 'যোগ' শব্দটিকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে বোঝাননি। 'যোগসূত্রে' তিনি 'যোগ' শব্দটিকে বিশেষার্থে, 'সমাধি-যোগ' অর্থে গ্রহণ করেছেন। যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জল বলেছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"[1], অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধই 'যোগ'। এক্ষেত্রে 'যোগ'-এর অর্থ প্রাঞ্জলভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রথমে 'চিত্ত' ও তার 'বৃত্তি' সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

সাংখ্যশাস্ত্রে উল্লিখিত মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার এবং মন– এই ত্রিবিধ তত্ত্বকে একত্রে যোগশাস্ত্রে 'চিত্ত' বলা হয়েছে। 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ 'পরিণাম'। মহৎ, অহংকার ও মন এই তিনটি তত্ত্ব প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতির পরিণাম এই চিত্তের বৃত্তি বা বিকার'কেই বলা হয় "চিত্তবৃত্তি"। প্রকৃতি স্বরূপতঃ অচেতন ও পরিণামী। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ চেতন্যবিশিষ্ট, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, উদাসীন ও বিকারবিহীন। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হওয়ার জন্য চৈতন্যের বিকার সম্ভবই নয়, চিত্তে প্রতিফলিত আত্মারই শুধু বিকার হয়। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ চিত্তে পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হয়। সত্ত্বগুণের আধিক্য হেতু চিত্ত অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়। সেইজন্য চিত্তের ওপর পুরুষ বা আত্মার চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হলে চিত্ত চেতনরূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রতিবিম্বনের ফলে, প্রতিফলিত পুরুষ বা আত্মা চিত্তের বিকারকে নিজের বিকার বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গতিশীল সলীল তরঙ্গে চন্দ্রমার প্রতিফলন হলে চন্দ্রমাকে যেমন সঞ্চরণশীল মনে হয়, তেমনি নির্বিকার পুরুষ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হলে চিত্তের বিকার বা বৃত্তিগুলিকে আত্মার নিজের বৃত্তি বা বিকার বলে মনে হয়। মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন কোনো বিষয়ের সহিত যুক্ত হয় তখন চিত্ত সেই বিষয়েরই আকার ধারণ করে। চিত্তের এই বিষয়াকারের গ্রহণই হলো চিত্তবৃত্তি বা চিত্তের বৃত্তি। চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মাই অবিদ্যাবশতঃ নিজেকে এইসব বৃত্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা বলে মনে করে এবং এই অবস্থাই পুরুষ বা আত্মার বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থায় পুরুষ পঞ্চক্লেশে[2] ক্লিষ্ট হয়, আর সেজন্যই বন্ধনমুক্তির হেতু স্বরূপ চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তির প্রয়োজন হয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্পন্ন হলে চিত্ত পরিপূর্ণভাবে বৃত্তিহীনরূপে অবস্থান করে। চিত্তের এইরূপ অবস্থাই হলো 'যোগ' বা 'সমাধি'। চিত্তের বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হলে প্রকৃতির সাথে পুরুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং পুরুষ স্ব-রূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাকে কৈবল্যাবস্থা বা মুক্তাবস্থা বলা হয়। সুতরাং, জীবের কৈবল্যসিদ্ধির জন্য চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ বা যোগ-সমাধির প্রয়োজন হয়।

যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ"[3]। অর্থাৎ, চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকারের– প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। **'প্রমাণ'** হলো যথার্থ জ্ঞান বা বৃত্তি। সাংখ্য-যোগশাস্ত্রে

---

[1] যোগসূত্র ১/২

[2] যোগশাস্ত্রে 'ক্লেশ' এমন এক মানসিক অবস্থা, যা মনকে অশুদ্ধতামূলক ক্রিয়ার দিকে ধাবিত করায়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার– অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। 'অবিদ্যা' হলো অজ্ঞান। অনিত্যকে নিত্য রূপে, দুঃখকে সুখ রূপে, অশুচিকে শুচি রূপে এবং অনাত্মাকে আত্মা রূপে ভ্রম জ্ঞানই হলো অবিদ্যা। অর্থাৎ, অবিদ্যাই সকল ক্লেশের মূল। 'অস্মিতা' হল অহং-অভিমান। বুদ্ধ্যাদি প্রকৃতির পরিনামকে পুরুষের 'আমার' মনে করাই হলো 'অস্মিতা'। 'রাগ' হলো সুখজনক বস্তুর প্রতি তৃষ্ণা বা আসক্তি। 'দ্বেষ' হলো দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা। 'অভিনিবেশ' হলো মৃত্যুভয়। সাধারণ পুরুষ এই পঞ্চক্লেশাধীন, কিন্তু বিশিষ্ট পুরুষরূপে ঈশ্বর এসব থেকে সদামুক্ত।

[3] যোগসূত্র ১/৬

তিনটি প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে- প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম্ বা শব্দ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সংযোগজনিত চিত্তের বৃত্তিই হলো প্রত্যক্ষজ্ঞান বা 'প্রত্যক্ষবৃত্তি'। এই প্রত্যক্ষবৃত্তি 'বাহ্য' ও 'আন্তর' ভেদে দ্বিবিধ। ঘটাদি বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের ফলে চিত্তের যে ঘটজ্ঞান বা ঘটাকার বৃত্তি হয়, তা হলো 'বাহ্যপ্রত্যক্ষবৃত্তি'। মন-রূপ অন্তরিন্দ্রীয়য়ের দ্বারা চিত্তের সুখ-দুঃখাদি মানসিক অবস্থা সমূহের যে বৃত্তি বা জ্ঞান হয় তা 'অন্তঃপ্রত্যক্ষবৃত্তি'। দৃষ্ট বস্তুর (হেতুর) জ্ঞানের সাহায্যে অদৃষ্ট বস্তুর (সাধ্যের) সম্পর্কে যে জ্ঞান বা বৃত্তি হয় তা 'অনুমানবৃত্তি', যথা- ধূম দর্শনের পর বহ্নি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। যথার্থবক্তা বা আপ্তব্যক্তির বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার চিত্তে যে বৃত্তির উৎপন্ন হয়, তাই শাব্দজ্ঞান বা আগমবৃত্তি।

'বিপর্যয়' হলো মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান। অর্থাৎ, যা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু তা জ্ঞানের অভাবও নয়। চিত্তবৃত্তি বিষয়ানুরূপ না হয়ে যদি ভিন্নরূপ হয় তাহলে তা হবে মিথ্যাজ্ঞান বা বিপর্যয়। যেমন, 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' হলো বিপর্যয় বা ভ্রান্তজ্ঞান। রজ্জুস্থলে চিত্ত রজ্জুর আকার গ্রহণ করার পরিবর্তে সর্পের আকার গ্রহণ করে, তাই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হলো বিপর্যয়। যে জ্ঞান কেবলমাত্র শব্দাশ্রিত, যেখানে শব্দের অর্থানুসারে কোনো বস্তু বাস্তবত থাকে না, অথচ সেই শব্দকে আশ্রয় করে কোনো একটি প্রচলিত অর্থে চিত্তের যে বৃত্তি বা জ্ঞান হয়, তাই **'বিকল্প'**। অর্থাৎ, বস্তুর অস্তিত্ব নাই অথচ শব্দজন্য একপ্রকার মনোবৃত্তি জন্মে, তাদৃশ মনোবৃত্তিই হলো 'বিকল্প'। অনাসন্ন কল্পনার নাম বিকল্প। যেমন- সোনার পাথরবাটি, আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, অশ্বডিম্ব বলে বাস্তবত কিছু না থাকলেও এইসব প্রচলিত শব্দ শুনে শ্রোতার চিত্তে একপ্রকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। নিদ্রাকালীন অবস্থায় জ্ঞানের অভাব বিষয়ক জ্ঞান বা বৃত্তি হয় বলে **'নিদ্রা'**ও একপ্রকারের চিত্তবৃত্তি। যোগশাস্ত্রে, 'নিদ্রা' অর্থে সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রাকে বোঝায়। গভীর নিদ্রাকালে জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা বা স্বপ্নাবস্থার অভিজ্ঞতা না হলেও, এইসব অভিজ্ঞতাসমূহের অভাবের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ, গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা বলে থাকি, 'আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার কোনো জ্ঞান ছিল না'। 'জ্ঞান নেই' এইরূপ অনুভবও জ্ঞান। কাজেই যোগশাস্ত্রে, নিদ্রাকালে জ্ঞানাভাবের চিত্তবৃত্তি হয়ে থাকে। পূর্বানুভূত হয়েছে এমন বিষয়মাত্র গ্রহণের জ্ঞান বা বৃত্তি হলো **'স্মৃতি'**। অতীত অভিজ্ঞতার বিষয়কে প্রতিরূপের আকারে অন্তরে ধারণ করাই সংস্কার, আর এই সংস্কারের পুনরুজ্জীবনই হলো স্মৃতি। অতীতকালে ঘট প্রত্যক্ষের ফলে চিত্তে ঘটাকারবৃত্তি সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকে। বর্তমানে আমার সম্মুখে ঘট না থাকলেও যদি সেই পূর্ব সংস্কারের উদ্রেক হয়, তবে ঘটাকারবৃত্তিরও উদ্রেক হবে। এভাবেই পূর্বানভূত বিষয়ের সংস্কারের যথাযথভাবে পুনরুজ্জীবনই হলো স্মৃতি।

এখন প্রশ্ন হলো, এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধের উপায় কি? পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র মতে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভাং তন্নিরোধঃ"[4]। অর্থাৎ, অভ্যাস (ধ্যানাভ্যাস) ও বৈরাগ্য সাধনের মাধ্যমেই ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের নিরোধ সম্ভব বলে যোগশাস্ত্রে স্বীকৃত। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বস্তুর প্রতি নির্লিপ্তভাব বা বিতৃষ্ণা ভাবকেই 'বৈরাগ্য' বলে। বৈরাগ্যের ফলে চিত্তের বিষয়মুখিতা অন্তর্হিত হয় এবং চিত্ত অন্তর্মুখী হয়, ফলতঃ আত্মা বা পুরুষের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়। পুরুষ বা আত্মার প্রতি এই চিত্ত-নিবেশকে সুদৃঢ় করবার জন্যই প্রয়োজন 'অভ্যাস'-এর। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত আত্মমুখী হলে চিত্তের সকল প্রকার মলিনতা দূরীভূত হয়। এইভাবে চিত্তশুদ্ধি হলে বিবেকখ্যাতি (পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান) বা বিবেকজ্ঞানের উদয় হয়।

[4] যোগসূত্র ১/১২

বিবেকখ্যাতিই দুঃখমুক্তি ও কৈবল্যলাভের উপায় স্বরূপ। অর্থাৎ, বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন, আর চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন অষ্টবিধ যোগানুষ্ঠান বা অনুশীলন। এই অষ্টবিধ যোগানুশীলনই পতঞ্জল যোগদর্শনে 'অষ্টাঙ্গিক যোগ' বা 'অষ্ট যোগাঙ্গ' হিসেবে প্রকটিত। এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের স্বরূপ হলো, "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"[5]। অর্থাৎ- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি; এই আটটি হলো যোগের অঙ্গস্বরূপ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ- এই পাঁচটি অঙ্গের সাধনকেই বলা হয় **'যম'**। 'অহিংসা' বলতে কায়-মন-বাক্যে সর্ববিধ হিংসাজনক ক্রিয়া থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়। অহিংসা কেবল নেতিমূলক সাধনমাত্র নয়, এর ইতিমূলক দিক হলো 'মৈত্রী'। হিংসা না করা হলো অহিংসার নেতিবাচক দিক, আর মিত্রসুলভ আচরণ তথা প্রেম-ভালোবাসার সিঞ্চনই হলো অহিংসার ইতিবাচক দিক। 'সত্য' বলতে বোঝায় সর্বপ্রকার অসত্যভাষণ ও চিন্তন তথা অপ্রিয়ভাষণ, অতিভাষণ প্রভৃতি বর্জন করে সর্বদা সত্যভাষণ ও সত্যচিন্তন অত্যাবশ্যক। সত্য অপ্রিয় হলে সেক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বন কাম্য। 'অস্তেয়' বলতে বোঝায়- যা নিজের নয়, অর্থাৎ পরদ্রব্য গ্রহণ থেকে সদা বিরত থাকা। এক্ষেত্রে অচৌর্য ব্রতে সাধক পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা পর্যন্তও করতে পারবে না। 'ব্রহ্মচর্য' হলো মূলতঃ জননেন্দ্রিয়ের সংযম। এর জন্য প্রয়োজন অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করা, মিতনিদ্রা ও মিতাহার অভ্যাস, এবং সর্বপ্রকার কামমূলক চিন্তা বর্জন করা। কামনা-বাসনারূপ তৃষ্ণার অধীনস্থ হওয়ার নাম 'পরিগ্রহ'। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপরের দান গ্রহণ না করে কেবলমাত্র দেহযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যের গ্রহণকে বলা হয় 'অপরিগ্রহ' (ত্যাগশক্তি)। এইরূপ যম সাধনার ফলে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় এবং চিত্তে যথোপযুক্ত বৈরাগ্যের উৎপন্ন হয়।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান; এই পাঁচ প্রকার অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার নাম **'নিয়ম'**। তন্মধ্যে 'শৌচ' (শুদ্ধ থাকা) বা শুচিতা দুই প্রকার- বাহ্য এবং আভ্যন্তর। শরীর পরিষ্কার করা, সাত্ত্বিক আহারাদি হলো বাহ্য শৌচ। অহং-অভিমান, অসূয়া প্রভৃতি সকল প্রকার চিত্তগত মলিনতা থেকে মনকে মুক্ত করে মৈত্র্যাদি সদ্গুণের অনুশীলনই অভ্যন্তর শৌচ। 'সন্তোষ' হলো তৃপ্তি বা অল্পে সন্তুষ্টি। যেটা পাইনি তার জন্য বিলাপ না করে যেটুকু পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। উচ্চাকাঙ্খায় চিত্ত চঞ্চল ও অস্থির হয়, কিন্তু সন্তোষের দ্বারাই চিত্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। 'তপস্যা' হলো সহণশীলতার অভ্যাস এবং ব্রতাচার অনুশীলন। চিত্তে স্থৈর্য বা সংকল্প সাধনের ক্ষেত্রে উপবাস, স্বল্পাহার, কোমলশয্যা বর্জনপূর্বক কঠিনশয্যা গ্রহণ, শীতোষ্ণ সহনাদি ক্রিয়া তপস্যার অন্তর্গত। 'স্বাধ্যায়' হলো যথাবিধি অর্থ সহ বেদপনিষদ ও ভগবদ্গীতাদি মোক্ষশাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন বা প্রণব-জপ। এর ফলে বিষয়বস্তুর চিন্তা ক্ষীণ হবে এবং আত্মজ্ঞানের বাসনা জাগরিত হবে। 'ঈশ্বর-প্রণিধান' হলো পরমগুরু বা ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান এবং পরমেশ্বরে সর্ব কর্ম সমর্পণ। ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ঈশ্বর পরম করুনাবশতঃ সাধকের সাধন পথের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসৃত করে সমাধিলাভের সহায়ক করে তোলেন।

স্থিরভাবে (নিশ্চল) সুখজনক উপবেশনই **'আসন'**। যেমন- পদ্মাসন, বীরাসান ইত্যাদি। শরীর সুস্থ ও নীরোগ না হলে যোগসাধনা সম্ভব নয়, তাই শারীরিক সুস্থতার হেতু আসন অত্যাবশ্যক। মনকে সুস্থ রাখার জন্য শরীরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সুস্থ দেহ-মনই চিত্ত সংযমের ক্ষেত্রে সহায়ক। আসন

[5] যোগসূত্র ২/২৯

জয় হলে পর, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও তাদের গতির যে রোধ (নিয়ন্ত্রণ), তাই হলো **'প্রাণায়াম'**। পূরক, রেচক ও কুম্ভক- এই তিন প্রকার শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে গতিবিচ্ছেদের ফলে চিত্তে স্থিরতা আসে এবং কোনো বিষয়ে চিত্তনিবেশ সম্ভব হয়। **'প্রত্যাহার'** হলো ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্য বিষয় থেকে মুক্ত রেখে চিত্তের অনুগত বা অন্তর্মুখী করা। ফলে চিত্তের বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হয় এবং তখন চিত্ত স্থিরভাবে ধ্যেয়বস্তুতে নিবিষ্ট হয়। দেশ বিশেষে চিত্তের স্থিতি হলো **'ধারনা'**। ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত জ্যোতিতে, নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রাদি শরীরাভ্যন্তরে, দেবমূর্তি বা ওঙ্কাকারাদি বাহ্য বিষয়ে চিত্তের বৃত্তিমাত্র সহায়ে সম্যক স্থিতিই ধারণা। ধারণা জনিত প্রত্যয়ের অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির একতানতা বা নিরবিচ্ছিন্নতাই হলো **'ধ্যান'**। **'সমাধি'** অবস্থায়, সেই ধ্যান'ই যখন তার বিষয়মাত্র প্রকাশে স্বরূপ-শূন্য-মতো হয়, অর্থাৎ চিত্ত ধ্যেয়বস্তুতে বিলীন হয়- ধ্যানক্রিয়া, ধ্যেয়বস্তু, ও ধ্যানকর্তার মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। এটি অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অন্তিম ও সর্বোচ্চ স্তর। অষ্টাঙ্গযোগান্তর্গত এই যোগ-সমাধি চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধি-যোগ থেকে পৃথক। সমাধি-যোগ হলো পুরুষের লক্ষ্য, কারণ এস্থলেই সাধকের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। আর যোগ-সমাধি হলো লক্ষ্যলাভের উপায় বা পথ, যাকে অবলম্বন করে সমাধি-যোগ আয়ত্ত করা সম্ভব। তাই বলা যায়, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধির (সমাধি-যোগের) জন্যই অষ্টাঙ্গিক যোগের (যোগ-সমাধির) প্রয়োজন হয়।

যোগশাস্ত্র মতে 'সমাধি-যোগ' দুই প্রকার- ধ্যানসমাধি বা **সম্প্রজ্ঞাত সমাধি** এবং পূর্ণসমাধি বা **অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি**। 'সম্প্রজ্ঞাত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো প্রকৃষ্ট বা সম্যকরূপে জ্ঞাত। এইরূপ অবস্থায় ধ্যেয়বস্তুকে সম্যক্ ভাবে জানা যায় বলে এই সমাধিকে 'সম্প্রজ্ঞাত' বলা হয়। ধ্যানসমাধির ক্ষেত্রে কেবল বিষয়টিতেই চিত্ত সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকে। এক্ষেত্রে বিষয়াকার অতিসূক্ষ্মরূপে থাকে বলে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরোধ হয় না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার- সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য-স্থূল-বিষয়ে চিত্তের ধ্যান-নিবিষ্ট হওয়াকে বলে 'সবিতর্ক সমাধি'। যেমন, দেবদেবীর মৃন্ময় মূর্তিতে চিত্ত নিবিষ্ট করা বা ধ্যানস্থ হওয়া। এই সমাধির দ্বারা পঞ্চভূতসমূহের জ্ঞান হয়। বাহ্য-স্থূল বিষয়ে চিত্তনিবেশ আয়ত্ত হলে যোগীগণ বিচার বিশেষের দ্বারা তন্মাত্রাদি বাহ্য-সূক্ষ্ম বিষয়ে সম্প্রজ্ঞান হওয়াকে বলে 'সবিচার সমাধি'। বাহ্য-সূক্ষ্ম-বিষয়ে চিত্তনিবেশ আয়ত্ত হলে যোগীগণ ইন্দ্রিয়াদি আধ্যাত্মিক স্থূল বিষয়ে চিত্তের-ধ্যান-নিবিষ্ট হওয়াকে 'সানন্দ সমাধি' বলে। এক্ষেত্রে যোগীর সর্বশরীরে এক আনন্দময় সাত্ত্বিক ভাবের অনুভব হয়। আধ্যাত্মিক স্থূলবিষয়ে চিত্ত নিবেশ আয়ত্ত হলে যোগীগণ বুদ্ধিতত্ত্ব এবং অহংকারতত্ত্বকে ধ্যানের বিষয় করেন, এখানে অহংবোধ বা অস্মিতা ধ্যানের বিষয় হওয়ায় একে বলে 'সাস্মিত সমাধি'। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বা আত্মাই ধ্যানের বিষয় হওয়ায় সাস্মিত সমাধিতে পুরুষ (আত্মা) স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই সাস্মিত অবস্থাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সর্বোচ্চাবস্থা। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের বিষয়াকার বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ বিষয়-বীজ থাকে বলে একে 'সবীজ সমাধি'ও বলা হয়।

'অসম্প্রজ্ঞাত' শব্দের অর্থ হলো, যে অবস্থায় বিষয়ের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না। 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'তে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যোগীর চিত্তবৃত্তি একে একে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে চিত্তে কোনো বাহ্য বিষয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয় না থাকায় তা সম্পূর্ণভাবে নিরালম্ব, এজন্য এই সমাধিকে 'নিরালম্ব সমাধি' বা 'নির্বীজ সমাধি' বলা হয়। এই পূর্ণ-সমাধিতে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ চিত্ত নিরুদ্ধ হয় এবং অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়। এখানে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ বিছিন্ন হওয়ায় পুরুষ অর্থাৎ

আত্মা চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাই হলো পরম পুরুষার্থ বা কৈবল্যাবস্থা বা মুক্তাবস্থা বা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির অবস্থা।

একটি ধরাবাঁধা ছকে ফেলে দর্শন বা দার্শনিককে সাধারণত আমরা যেভাবে বুঝি, শ্রীঅরবিন্দ সেই জাতীয় নকশায় তাঁর দর্শনচিন্তার পদ্ধতিকে রুদ্ধ রাখার পরিপন্থী। তবে ভারতীয় দর্শনের আদর্শেই তিনি দার্শনিক ছিলেন, তাই এক্ষেত্রে দর্শনচর্চায় নিরত থেকে চর্যার বিসর্জন দিয়েছেন এমন বলা যাবে না। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটিয়ে তত্ত্বসমৃদ্ধ যে নব্য স্রোত ভারতীয় দর্শন চিন্তার গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাতে দেহ, মন, প্রাণ ও আত্মার এবং অপরদিকে ব্যক্তি এবং সমষ্টির প্রতিও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের এই দর্শনচর্চা, জীবনচর্যার মধ্য দিয়েই রূপায়িত হবে, এই পার্থিব জীবনেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রৈতি।'[6]

সাংখ্য-যোগশাস্ত্রে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের যে ভ্রমাত্মক একাত্মতা স্থাপিত হয়েছিল তার থেকে পুরুষ সচেতন হয়েছে এবং প্রকৃতি থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রকৃতির প্রতি বন্ধনজাত দুঃখ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। এই ধরনের দ্বৈতবাদ এর কথা এবং তজ্জনিত দুঃখ অতিক্রমের হেতু অভ্যাস-বৈরাগের কথাও বলা হয়েছে এই দুই শাস্ত্রে। কিন্তু, এই ধরনের দ্বৈতবাদকে শ্রীঅরবিন্দ 'অসম্পূর্ণ' (a half-way house) বলে অভিহিত করেছেন।[7] প্রকৃতি ও পুরুষ দুটি পরস্পর বিরোধী ও পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তা বলে মনে করা হয়, তবে সেই সত্তা দ্বয় কেমন করে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বিত থাকে তা সাধারণ বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট হয় না। এই প্রকারের আধিবিদ্যক দ্বৈতবাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়াসে নানান ধরনের আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বিচারের দিক থেকে এইরকম মতবাদকে স্বীকার করা কঠিন বলেও শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছেন।

ব্রহ্ম থেকে জগৎ সৃষ্টি রহস্যের সমাধানকল্পে বেদোপনিষদ, গীতাদি শাস্ত্রে কিছু সহায়ক আভাস দেওয়া হয়েছে। ঋষি অরবিন্দ এইসব উৎসের ভিত্তিতেই তাঁর নিজস্ব সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন। তাঁর মতে, পরমসত্তা ব্রহ্ম কেবলমাত্র নির্বিশেষ এবং জগৎ-অতিশায়ী'ই নয়, স্ব-সীমাকরণ ও স্ব-বিশেষীকরণের মাধ্যমে নিজেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টিশীল প্রকাশে ব্যক্ত করতেও সক্ষম। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে– ব্রহ্ম এই অর্থে নির্বিশেষ যে, ব্রহ্মকে কোনো বিশেষণ দ্বারা সীমিত করা যায় না। কিন্তু ব্রহ্ম এই অর্থে নির্বিশেষ নয় যে, তিনি নিজেকে বিশেষিত করতেই সমর্থ নন।[8] কোনো শক্তি বা গুণ দিয়ে ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না সেটা এজন্য নয় যে, এইসব শক্তি বা গুণ ব্রহ্মে নিহিত নেই; বরং এজন্য যে এইসব শক্তি বা গুণ দিয়ে ব্রহ্মকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করা যায় না। সম্ভাব্য সকল গুণ ও শক্তিই ব্রহ্মে নিহিত, তবুও ব্রহ্ম ঐসব গুণ ও শক্তির অতিরিক্ত আরো কিছু। ব্রহ্ম জগতে অন্তর্লীন এবং একইসঙ্গে জগৎ-অতিশায়ী।

---

[6] দিব্যজীবন, অনির্বাণ (অনু.), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, ২০০১, পৃষ্ঠা-৬।

[7] ঘোষ. পীযূষকান্তি ও মিত্র. কুমার, সমকালীন দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৬।

[8] Sri Aurobindo, *Commentary on Ishavasya Upanishad*, p. 284; এটি প্রথম *'Arya'* পত্রিকায় (1914-15) প্রকাশিত হয়, পরে বই আকারে Aurobindo Ashram, Pondicherry থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে এটির চতুর্থ সংস্করণের (1945) উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনতত্ত্বের সমগ্র কাঠামো যে মূল ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা হলো- 'আত্মা' ও 'জড়' উভয়ই সত্য, এই দুই তত্ত্বের প্রকৃত সমন্বয়সাধনের মধ্য দিয়ে যথার্থ দার্শনিক উপলব্ধি সম্ভব হবে। 'আধ্যাত্মবাদ' ও 'জড়বাদ', এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব এই জগৎকে নিজের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে। জড়বাদীরা 'আত্মা'কে মনের কল্পনামাত্র বলে তা অবজ্ঞা করেছেন, তেমনি আধ্যাত্মবাদীরা বাহ্য-জগৎকে কল্পনামাত্র বলে অবজ্ঞা করেছেন। সেইদিক থেকে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন এই দুই মূল তত্ত্বের সমন্বয়সাধন করেছে। 'দিব্য-জীবন' গ্রন্থে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন: এই ধরণীতে দিব্য-জীবনের উপলব্ধি ততক্ষণই সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে জড়-দেহাভ্যন্তরে শাশ্বত অধ্যাত্ম-শক্তির আবাসস্থল। অরবিন্দের অধিবিদ্যার প্রধান চালিকা শক্তি হলো চৈতন্যশক্তি বা চিৎশক্তি। সত্যতাকে তিনি চরম আধ্যাত্মিকরূপে মানলেও, তার মধ্যে তিনি জড়কে সংস্থাপন করেছেন। 'সত্য' যদি আধ্যাত্মিক হয়, তবে জড়ের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান। তাই জড়কে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করাও ভ্রমাত্মক হবে। 'জড়' এবং 'চিৎ'- এরা একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন দিকমাত্র। যদি জড় থেকে চৈতন্যে উন্নীত হওয়া যায়, তবে নিশ্চিতরূপে চৈতন্য থেকে জড়ে অবতরণ করা যাবে। তাই জড়জগৎ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কখনোই হতে পারে না।

অরবিন্দের উপলব্ধি অনুযায়ী সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য সচ্চিদানন্দ বা সৎ (Being)-এর স্তরসমূহ বা তন্ত্রীগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে, তিনি সৎ-এর বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করলেও 'সত্যতা প্রকৃতিতে বহু' এভাবে বলেননি। সত্যতা অপরিহার্যভাবে এক, কিন্তু সৃষ্টি নির্ভর করে 'একত্ব' ও 'বহুত্ব'- এই দ্বিমুখী তত্ত্বের ওপর। শ্রীঅরবিন্দ এক্ষেত্রে সত্তার আটটি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে- শুদ্ধ সত্তা, চিৎশক্তি, পরম সুখ, অতিমানস, মানস, মন (psyche), জীবন বা প্রাণ এবং জড়। প্রথম চারটির স্তর উচ্চ গোলার্ধে এবং শেষের চারটি স্তর নিম্ন গোলার্ধে অবস্থান করে।[9] এখানে চরম সত্তাকে তিনি বলেছেন 'সচ্চিদানন্দ', যা সবকিছুর উৎস। অস্তিত্ব, চৈতন্যশক্তি এবং পরম সুখ- এই ত্রয়ীর নামই সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দই নিশ্চেতনার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে স্বরূপে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেন। 'প্রাণ' তাঁরই চিৎ শক্তির নিম্নাংশিক প্রকাশ, এবং 'মন' তাঁরই সৃজনী শক্তি অতিমানসের প্রতিকৃতি। কাজেই, সচ্চিদানন্দ থেকেই যে জড়ের উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

সৃষ্টির প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো, স্বরূপে অবস্থিত 'সত্তা'র জাগতিক আকার, যাকে **'অবরোহন'** (Descent) বলা হয়। এই পর্বে বিশ্বের গতি সর্বদা অধোমুখী। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আবার বিকাশ সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী, তখন তা স্বরূপে অবস্থিত সত্তার অভিমুখে অগ্রসর হয়, এই পর্বকে বলা হয় **'আরোহন'** (Ascent)। প্রথম পদ্ধতিটি হল 'সংকোচন' (involution), এবং পরের পদ্ধতিটি হল 'বিবর্তন' (evolution)। শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের প্রাগবস্থা হলো 'কুণ্ডলীকরণ' বা সংকোচন (involution)। প্রকৃতপক্ষে বিবর্তন (evolution) সম্ভব হয় তার কারণ হলো কুণ্ডলীকরণ প্রক্রিয়াটি ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। উক্ত দুই পদ্ধতির মধ্যে যুক্ত রয়েছে সত্তার আটটি স্তর। আধ্যাত্মশক্তি প্রথমে জড়াদি নিম্নস্তরে অবরোহন করে, তারপর আবার শুদ্ধ সত্তাদি উচ্চস্তরে আরোহন করবে। জড় থেকেই প্রাণের উদ্ভব হয়েছে

[9] বন্দ্যোপাধ্যায়. নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯০।

কেননা প্রাণ জড়ের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় ছিল, আবার প্রাণ মনের স্তরে উন্নীত হয়েছে কেননা প্রাণের মধ্যই মন সুপ্ত অবস্থায় ছিল।

শ্রীঅরবিন্দের বর্ণনে বিবর্তনের যে চিত্র পরিস্ফুট, তার সাথে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় নিযুক্ত চিন্তাবিদ্গাণের বিবর্তন ভাবনার সাথে কোনো মিল পরিলক্ষিত হয় না। কেউ 'যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের' কথা বলেন, এখানে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা হয় পূর্ববর্তী শর্তের ওপর ভিত্তি করে। কেউ 'উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদের' কথা বলেন, এক্ষেত্রে বিবর্তনের সব ক্ষেত্রেই একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। আবার কেউ 'পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনবাদের' কথা বলেন, যেখানে বলা হয় বিবর্তন হলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই আকৃতি ও বিষয়ের পুনঃসংগঠনমাত্র, অর্থাৎ সত্তার পুনরাবৃত্তিমাত্র। কেউ কেউ আবার 'উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের' কথা বলেন, যা পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনবাদের বিপরীত মতবাদ। এই জাতীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু, এক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তনমূলক তত্ত্ব হলো 'অখন্ড বিবর্তনবাদ' (Integral Evolution)। এই বিবর্তনবাদের বৃদ্ধি ঘটে ত্রিবিধ পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রথম পদ্ধতিটি হলো 'প্রশস্তকরণ' (widening), এখানে নতুন তত্ত্বের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো 'উন্নতিবিধান করা' (leightening), যার অর্থ হলো এক ধাপ থেকে অপর এক উন্নত ধাপে আরোহন। তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো 'অখন্ড সমন্বয়করণ' (integration), এই অখণ্ডতাই হলো বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।[10]

শ্রীঅরবিন্দের মতে, **'অতিমানস'** (Supermind) স্তর হলো স্বতঃই সত্যের অধিকারী, কেবল মানসিক জ্ঞানের মতো চিত্র বা চিহ্ন নয়। **'সাধারণ মন'** ও অতিমানসের মধ্যে আরও কয়েকটি স্তর স্বীকার করা হয়েছে, যাদের মধ্য দিয়ে অতিমানস সাধারণ মনের স্তরে নেমে আসতে পারে, আবার সাধারণ মনও ক্রমশঃ অতিমানসের স্তরে আরোহন করতে পারে। প্রখরতা বা তীব্রতার প্রভেদ হেতু স্তরগুলি নিম্ন বা উচ্চ। সাধারন মানস চেতনার ঊর্ধ্বস্তরে আছে **'উত্তর মানস'** (Higher mind)। এই স্তরে সাধারণ মনের মতো সত্যান্বেষণ করতে হয় না, চিন্তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, যাকে সত্য-চিন্তন বা দিব্য-মননও বলা হয়। এই স্তরের চেয়ে অধিক দীপ্ত চেতনা হলো **'দীপ্ত মন'** বা **'প্রবুদ্ধ মানস'** (Illumined mind)। এই স্তরের শক্তি ও প্রখরতা তুলনামূলক অনেক বেশি এবং এই স্তরকে সত্য ও প্রাণ বলা হয়। এই স্তরের ঊর্ধ্বে সত্যশক্তির আরও মহত্তর শক্তি রয়েছে, একে বোধি বা প্রজ্ঞা বলা হয়। শ্রীঅরবিন্দ যাকে **'বোধি মন'** (Intuitive mind) বলে অভিহিত করেছেন। এই বোধি'ই হলো নিবিড় ও নির্ভুল, সত্যদৃষ্টি, সত্যানুভূতি, সত্যচিন্তন ও সত্যক্রিয়া। এই প্রজ্ঞার উৎসস্থলে রয়েছে **'অধিমানস'** (Overmind), যা অতিমানস 'ঋত' চেতনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু, এই স্তরেও অধিমানসের 'হিরন্ময় পাত্র' দ্বারা ঋত চেতনার মুখাচ্ছাদিত থাকে, এবং অধিমানস পরার্ধ ও অপরার্ধের সংযোগসূত্র এবং অবিদ্যা ও অজ্ঞানের মধ্যে অতিমানস চেতনার প্রতিভূ। অতিমানসের চেতনা অখন্ড; সেখানে পুরুষ, প্রকৃতি, চিৎ, শক্ত্যাদি– এক সমগ্র সত্য। আর অধিমানস চেতনায় অখণ্ডতা নেই, এরা প্রত্যেকে পৃথক, এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এরা জ্ঞানকে বিকশিত করে।[11]

---

[10] বন্দ্যোপাধ্যায়. নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯৬।

[11] বন্দ্যোপাধ্যায়. নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫।

'দিব্য-জীবন' (Divine Life) হলো বিবর্তনের পরম ও চরম লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছেন, এই জগতের বুকে দিব্য-জীবন একদিন নেমে আসবেই, হয় দ্রুত নতুবা বিলম্বিত। তবে আধ্যাত্মিক কার্যক্রম এই অবতরণকে সত্বর কার্যকরী করতে সক্ষম। কিন্তু কিভাবে, কত নির্দিষ্ট এবং কত দ্রুততার সাথে এটা সম্ভব হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,- এটা করা সম্ভব হবে শুধুমাত্র 'যোগ'-এর মাধ্যমে। তিনি *The Life Divine, The Synthesis of Yoga, Letters of Yoga, Records on Yoga* প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে যেভাবে যোগের প্রকৃতিকে বুঝিয়েছেন তার পূর্ণাঙ্গ ও সবিস্তার বর্ণন এই স্থলে সম্ভব নয়। তার প্রথম কারণ হলো, এই বর্ণনা হবে বিশালকায়; এবং দ্বিতীয় কারণ হলো, এই যোগ অনিবার্যরূপে 'তন্ত্রে'র ওপর নির্ভরশীল, যা দর্শনালোচনার ব্যাপ্তি বহির্ভূত। তাই এই স্থলে কেবল শ্রীঅরবিন্দের 'অখণ্ড যোগ' (Integral Yoga)-এর দার্শনিক তত্ত্বালোলোচনা করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ যোগের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন, 'যোগ'-এর অর্থ হলো 'ঐশ্বরিক সত্তার সাথে অন্বিত হওয়া'। এই সংযুক্তিকরণ হতে পারে একক-ব্যক্তিগত কিংবা জাগতিক কিংবা অতিজাগতিক, কিংবা তিনটি একসাথেই। এইসব সঙ্গত করণের জন্যই তাঁর যোগকে বলা হয় **'অখণ্ড যোগ'** (Integral Yoga)। আমরা শ্রীঅরবিন্দের 'অখণ্ড যোগ' সম্পর্কে অল্প-বিস্তর অবহিত হলাম, এবং প্রবন্ধের প্রথমাংশে মহর্ষি পতঞ্জলের সমাধি-যোগ সম্পর্কে সবিস্তার অবগত হয়েছি। পর্যায়ক্রমে আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায় 'সমাধি-যোগ' ও 'অখণ্ড যোগ' নানান দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সেই পার্থক্যগুলো যথাক্রমে:

1) মহর্ষি পতঞ্জলের যোগ সমন্বয় হলো 'পদ্ধতির সমন্বয়'। অপরপক্ষে, শ্রীঅরবিন্দের যোগ সমন্বয় হলো 'ফলের সমন্বয়'। পতঞ্জল যোগে হঠযোগ, আসন ও প্রাণায়ামের জটিল শ্বাস-প্রশ্বাস ও দেহের নানান অঙ্গবিন্যাস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এই বিষয়সমূহ শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ গুরুত্ব দেননি (যদিও শ্রীঅরবিন্দ হঠযোগের অভ্যাস বাধ্যতামূলক করেননি তাঁর পদ্ধতিতে, তবুও এর ফলাফল পাওয়া যায় তাঁর পদ্ধতিতে)। এমনকি প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চারণকেও তিনি সমর্থন করেননি। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-যোগ হলো অন্তরের যোগ, যেখানে কিছু নিয়মশৃঙ্খলা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতাবোধের প্রয়োজন। যোগের এই সারল্যের রূপরেখা সকলেই সহজভাবে অনুসরণ করতে পারে।
2) পতঞ্জল যোগে আত্মোপলব্ধিতে তুরীয় অবস্থায় কোনো বিষয়েরই চেতনা থাকে না। এই অবস্থা চেতনার অপর তিনটি নিম্নাবস্থা যথাক্রমে জাগ্রত, স্বপ্নময় ও স্বপ্নহীন অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। কোনো ব্যক্তিবিশেষ যখন চেতনার তুরীয় অবস্থা থেকে জেগে ওঠে এবং জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসে, তখন তার সমাধি ভেঙে যায়। এই পরিস্থিতিতে আত্মা মানসিক অবস্থার দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করে। তাই আত্মোপলব্ধি কেবলমাত্র সমাধি অবস্থাতেই সম্ভব। কিন্তু, শ্রীঅরবিন্দের মতে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমাধি অপরিহার্য নয়, যেটা অপরিহার্য সেটা হলো 'জাগ্রত চৈতন্যের রূপান্তর'। এতদ্ব্যতীত যোগ কোনভাবেই চরম ফল প্রদান করতে পারে না।
3) মহর্ষি পতঞ্জলের মতে, শুদ্ধ চেতনার অবস্থায় উত্তরণই যোগের লক্ষ্য। ঈশ্বরোপলব্ধির একমাত্র উপায় আত্মোপলব্ধি,- এটাই চরম লক্ষ্য, অর্থাৎ যোগের লক্ষ্য একক ব্যক্তির মুক্তি। শ্রীঅরবিন্দের মতে, ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি বিশ্বচেতনার উপলব্ধির থেকে নিম্নমানের। আমিত্বকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেই এই পৃথিবীতে অতিমানসের অবতরণ ঘটবে। যোগের চরম লক্ষ্যের একটা দিক হলো একক ব্যক্তির

মোক্ষ, কিন্তু চরম লক্ষ্য এই যে- সমগ্র মানব জাতির পুনরুদ্ধার এবং পৃথিবীতে দিব্য-জীবনের উন্মেষ ঘটানো।

4) পতঞ্জল যোগের লক্ষ্য বিবেকজ্ঞান অর্জন করা, যার মাধ্যমে কেবল আত্মা থেকে অনাত্মাকে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে পুরুষকে পৃথক করা যায়। কিন্তু, শ্রীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য জ্ঞানের মধ্যে পৃথকীকরণ নয়, বরং জড় ও চিৎ-এর সমন্বয়সাধন অর্থাৎ অনাত্মাকে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করা।[12]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায়, যোগের আলোচনা প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জল এবং শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই অনন্য ও সুসংহতভাবে তাঁদের স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহর্ষি পতঞ্জল চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলেছেন। এক্ষেত্রে কিভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলে যোগী বিবেকজ্ঞানের উদয়ের মাধ্যমে সমাধি-যোগে পদার্পণ করবেন, তার চমকপ্রদ ব্যাখ্যাও তিনি প্রদান করেছেন। আবার, শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড-যোগে চিৎ এবং অচিৎ-এর সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে কিভাবে অবরোহন ও আরোহন পদ্ধতির দ্বারা দিব্য-জীবনের উন্মেষ ঘটানো যায়, তার অপরূপ বর্ণনা রয়েছে। এই স্থলে পাতঞ্জল-যোগ ও শ্রীঅরবিন্দের যোগের তুলনামূলক আলোচনা থাকলেও, সেক্ষেত্রে বিষয় গাম্ভীর্যে দুই দর্শনই নিজস্ব গরিমায় সমুজ্জ্বল। যোগের ব্যাখ্যায় তারা প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরমার্থ সাধনের কথা বলেছে। তাই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের রত্নভান্ডারে এই দুই যোগশাস্ত্র চিরকাল স্বমহিমায় দীপ্তিমান থাকবে।

[12] বন্দ্যোপাধ্যায়. নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. কয়াল, রাজর্ষি, 'যোগশিক্ষা', ক্লাসিক বুকস্, কলকাতা, ২০২২।
2. ঘোষ, পীযূষকান্তি ও মিত্র, কুমার, 'সমকালীন দর্শন', ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।
3. দিব্যজীবন, অনির্বাণ (অনু.), 'শ্রী অরবিন্দ আশ্রম', পন্ডিচেরী, ২০০১।
4. প্রেমেশানন্দ, স্বামী (ব্যাখ্যা), 'পাতঞ্জল-যোগসূত্র', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৭।
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা, 'সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯।
6. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, 'বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন', সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫।
7. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার (সম্পা.), 'পাতঞ্জলদর্শন', শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪।
8. ভর্গানন্দ, স্বামী (অনু.), 'পাতঞ্জল যোগদর্শন', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৬।
9. ভট্টাচার্য, কুন্তলা, 'শ্রী অরবিন্দ, বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনচর্চা', নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০২৩।
10. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, 'ভারতীয় দর্শন', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮।
11. রায়, সুনীল, 'শ্রী অরবিন্দের দর্শন মন্থনে', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০৭।
12. সান্যাল, ইন্দ্রানী, 'দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর পূর্ণাদ্বৈতবাদ', আধুনিক ভারতীয় দর্শন, সেবন্তী ভট্টাচার্য (সম্পা.), এবং মুসায়েরা, কলকাতা, ২০১৮।
13. সেনগুপ্ত, কল্যাণ, 'পাতঞ্জল-যোগসূত্র', পান্ডুলিপি, কলকাতা, ২০২৩।
14. *The Life Divine*, Sri Aurobindo, Volume 21 and 22, The Complete Works of Sri Aurobindo, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2005.